বইয়ের মানুষ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ: একজীবনে অনেক জীবন

মামুনুর রশীদ

প্রকাশ: ২৯ জুলাই ২০২২, প্রথম আলো

মানুষটি ছুটতে ছুটতে একসময়ে কিংবদন্তি হয়ে গেছেন। একরৈখিক মানুষ তিনি নন, বহুমাত্রিক তাঁর কর্মযজ্ঞ। আর তাঁর জীবনের নেই কোনো অবসর। নিত্যদিন তাঁর মনে নতুন নতুন ভাবনা জেগে ওঠে, যা আমাদের নতুনভাবে বেঁচে ওঠার স্বপ্ন দেখায়। এই স্বপ্নবান মানুষটি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। ৮২-তে পৌঁছেও তাঁর বয়স বাড়ে নি, ১৮ থেকে ১৯-এ আটকে রেখেছেন নিজেকে। তাই তাঁর গোঁফের পরিধি কমে নি, সুদূরের স্বপ্নের হাতছানিভরা চোখটাও পাল্টে নি, শুধু বয়সের সংখ্যাটি বেড়েছে।

সংস্কৃতি নির্মাণে যেকোনো মানুষের প্রয়োজন সঠিক বোঝাপড়া। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ঢুকে গেলেন নিজের আরাধ্যকর্মে–শিক্ষকতায়। তিনি ভাবতেন, শিক্ষাটা শুধু পাঠক্রম বা শ্রেণিকক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, শিক্ষা হবে মানুষের সংস্কৃতি নির্মাণের বাতিঘর। আর তার জন্য প্রয়োজন মানুষ। সতীর্থ, ছাত্র, সহকর্মী সবাইকে এ-বিষয়ে ভাবাতে হবে। সেই লক্ষ্যেই তিনি শুরু করলেন কাজ। প্রথমে একলা চলো অভিপ্রায় নিয়ে শুরু, পরে তাঁর যাত্রাপথের সাথি হলো বহুজন।

বিশেষত তখন যাঁরা ছাত্র, যাঁরা নবীন, তাঁদের পাশে পেলেন তিনি। সেই যাত্রায় তিনি ভাবলেন, নতুন সাহিত্য চাই, আধুনিক সাহিত্য। তবে আধুনিক সাহিত্যের জন্য তো প্রয়োজন নতুন লেখক, যাঁরা নতুন করে আবিষ্কার করতে চান নিজেকে। এই ভাবনার গুটিকয় মানুষকে নিয়ে যাত্রা শুরু হলো নতুন সাহিত্যের।

বহু কষ্টে দিনের পর দিন হেঁটে, প্রেসের নির্ভুল প্রুফ দেখে সায়ীদ ভাই প্রকাশ করলেন কণ্ঠস্বর-এর মতো উন্নতমানের সাহিত্য-পত্রিকা। কিন্তু পত্রিকার জন্য লেখা চাই, অর্থ চাই। তবে অর্থ অনিশ্চিত, লেখাও তাই। ফলে অনিশ্চিত যাত্রাপথে আবার সাথিদের জাগ্রত করলেন তিনি। বলা বাহুল্য, এই জাগ্রত করার কাজটি দীর্ঘদিন ধরেই তিনি করেছেন, সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে যখন শুরু করেছিলেন, তখন থেকেই। শিক্ষকতার শুরু থেকেই হয়তো-বা সায়ীদ ভাইয়ের মাথায় ভর করেছিলেন ডিরোজিও। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে মধুর কিন্তু তর্কমূলক একটা সম্পর্ক থাকা দরকার, ছাত্রদের কাছে শিক্ষকের দরজা যদি অবারিত না থাকে, শিক্ষক যদি ছাত্রের বন্ধু হতে না পারে, তাহলে শিক্ষার একটা বড় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়–এসব প্রথম থেকেই জানতেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

এখানেই আমরা ষাটের দশকে পেয়ে যাই একজন মুক্তচিন্তার মানুষকে, সংস্কারের অন্ধকার

ভেদ করে যিনি দাঁড়ান আমাদের সামনে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলেন, শ্রেণিকক্ষের বাইরেও 'অপাঠ্য' বই খুঁজতে হবে। তাঁর প্রেরণায় ছাত্র ও সহকর্মীরাও নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখলেন। আর নতুন সাহিত্যের পাঠ তো তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আগেই।

এক জীবনে সায়ীদ ভাইয়ের অনেক জীবন। তিনি সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে খ্যাতিমান, লেখক হিসেবে অনুকরণীয়, শিক্ষক হিসেবে অনুপ্রেরণাদায়ী, উপস্থাপক হিসেবে ঈর্ষণীয় এবং সংগঠক হিসেবে অনন্য। সাংগঠনিক দক্ষতা প্রথম থেকেই তাঁর ছিল। তাই ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি যেমন শিক্ষকদের সঙ্গে এক অভিনব সম্পর্ক নির্মাণের চেষ্টা করেছেন, তেমনি নিজে যখন শিক্ষক হয়েছেন তখন তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

সায়ীদ ভাইয়ের সাংগঠনিক দক্ষতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন সম্ভবত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, দর্শন এবং উন্নত বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনার আশ্রয় হলো এই বিদ্যায়তন। এর শুরু একেবারে ছোট্ট পরিসরে, তারপর আস্তে আস্তে বড় হওয়া। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের জীবনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, একজীবনে তিনি যত কাজ করেছেন, তার কোনোটিই জনবিচ্ছিন্নতার মধ্যে ভাবেন নি। সব সময়ে তারুণ্য আর সম্ভাবনাময় মেধার সমন্বয়ে এগিয়েছেন–কখনো ধীরে, কখনো দ্রুতগতিতে। শিল্পের সব শাখায় বিচরণ করেছেন অনায়াসে।

একবার আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পুরোনো ইসফেনদিয়ার মিলনায়তনে নাটকের মঞ্চ গড়ে তুলেছিলাম। মঞ্চটি জমেও উঠেছিল। বেশ কিছু প্রদর্শনী হলো। কিন্তু সায়ীদ ভাই একসময়ে সেটি বন্ধ করে দিলেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র শুধু নাটকের মিলনায়তন হোক এটা তিনি চান নি। তাঁর এই আচরণে আমরা সেদিন খুব অবাক হয়েছিলাম। যে সায়ীদ ভাই নাটক দেখেন, নাটক নিয়ে বিস্তর কথা বলেন, একদা 'ফেরদৌসী' নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তখন বুঝি নি তিনি কেন এমন করলেন!

সেই ষাটের দশকে সায়ীদ ভাই আমাদের অ্যাবসার্ড থিয়েটারের কথা বলেছেন। আয়োনেস্কোর চেয়ার নাটকটি আমাকে দিয়েছিলেন পড়ার জন্য। নাটকটি সে-সময়ে বুঝি নি অবশ্যই। সাহিত্যে জাদুবাস্তবতার কথা যখন তিনি আমাদের বলেছিলেন, তখন মনে হয়েছিল এই সাহিত্যের তিনিই নায়ক। কারণ, অবিশ্বাস্য সব ঘটনা তিনি অবলীলায় ঘটিয়ে চলেছেন।

অথচ নাটকের প্রদর্শনী হবে–এটা করতে দিলেন না? পরে জানলাম, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নতুন ভবনে একটি মঞ্চ হবে। সেটি হলোও বটে, কিন্তু মঞ্চটি অভিনয় উপযোগী নয়। এ-ক্ষেত্রে সায়ীদ ভাইয়ের সহজ উত্তর, "নাটক একটা সর্বগ্রাসী মাধ্যম। এর মধ্যে এত মায়ামমতা, ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব রয়েছে, সেখান থেকে চেষ্টা করলেও বেরিয়ে আসা যায় না। তাই নাটকের যে ইন্টেলেকচুয়াল দিকটা আছে, সেটাই হবে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বিষয়।

সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্য–এসবের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ”

সায়ীদ ভাই সব জায়গায় উপস্থিত করেছেন নতুন ব্যাখ্যা, নতুন ভাবনা। একসময় নতুন ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে তিনি হাজির করেছেন ‘দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যকর্মের মধ্যে দুর্বলতা খুঁজে তা প্রকাশ করার সাহস সহজ নয়। অথচ সায়ীদ ভাই এই কাজটি করেছেন অনেক আগে। রবীন্দ্রনাথের বিশাল সমর্থক, পাঠক–সর্বোপরি মধ্যবিত্তের জীবন-ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেভাবে জায়গা করে নিয়েছেন, সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে ছোটোখাটো আঘাতও অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। এ-ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান সৈয়দের মন্তব্যে চোখ রাখা যেতে পারে, “দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ তারুণ্যজনিত দুরুক্তিতে ভরা, এটাই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের প্রথম প্রবন্ধ, যা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর অনেক যুক্তি শিবনারায়ণ রায় ও বুদ্ধদেব বসুর রচনা থেকে আহৃত হলেও ভিতরে ভিতরে সায়ীদ তাঁর নিজস্ব কিছু মন্তব্য গেঁথে দিয়েছিলেন।
রবীন্দ্রনাথে বাস্তবতার অভাব, শারীরিকতার অভাব, কবিত্বের প্রতি উন্মুখিতা, বন্দিত জীবনদেবতা–এই সবকেই আর একবার অতীব্র আক্রমণ করেছিলেন সায়ীদ। যুগে যুগে অবশ্যই নতুন নতুন রবীন্দ্রবিচার চলতেই থাকবে; রাবীন্দ্রিক অভাবগুচ্ছেরও শনাক্তকরণ ও বীথিকরণ আমাদের জন্য অপ্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু তার জন্য চাই সুস্থ শান্ত দৃঢ় যুক্তিপূর্ণ শিল্পবিবেচনা, আবেগীনির্মুক্তি নয়। এই বোধ অচিরকালের মধ্যে রোজগার করে নেন সায়ীদ এবং তাঁর উত্তরকালিক রবীন্দ্রবিচার ‘সান্ধ্যসঙ্গীতের রবীন্দ্রনাথ’ ও ‘প্রভাতসঙ্গীতের রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধদ্বয়ে সুশান্তও নিরুত্তেজ, গুণগ্রাহী ও বিশ্লেষণশীল হয়ে উঠেছে। ”

দেশ ও বিদেশের আধুনিক সাহিত্যের ভাবনায় তত দিনে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছে। অবিচল, অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে তিনি এগোতে শুরু করলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, চরম ব্যর্থতা ও হতাশার মধ্যেও তিনি নতুন একটা চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করতে পারেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বিভিন্ন সাংগঠনিক পর্যায়ে সব সময়ে যে সবকিছু ইতিবাচক হয়েছে তা নয়, আশাহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে–বাঙালি জীবনে যা স্বাভাবিক। এই সব ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছেন *সংগঠন ও বাঙালি*। এই বইয়ে বাঙালির চরিত্রের মধ্যে সাংগঠনিকতার যেসব দুর্বলতা আছে, তা তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে আলস্যপ্রবণ বাঙালির জীবনকে কত যে নান্দনিকভাবে তিনি উপস্থিত করেছেন! তবে তাঁর সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা জানেন, এর মধ্য থেকেই তিনি শক্তি অর্জন করেছেন তিল তিল করে।

বাঙালিকে পাঠাগারের সীমানায় নিয়ে আসার জন্য একদা সায়ীদ ভাই চালু করলেন ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার। চারদিকে কাচ দিয়ে ঘেরা একটা বড় ট্রাকের মধ্যে সুন্দর করে সাজানো বইগুলো শিশু-কিশোরদের দ্রুত আকর্ষণ করল। এ যেন হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালার কাচের ঘর। এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়িভর্তি বই নিয়ে ভ্রাম্যমাণ এই পাঠাগার পৌঁছে যায়।

একজীবনে এই যে অনেক জীবনযাপন করলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, এর মধ্য দিয়ে তিনি আসলে কী করলেন? মানুষের চিত্তের উৎকর্ষ সৃষ্টিতে যেমন কাজ করলেন, একইভাবে নিজের সমুদয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করলেন এক ঐন্দ্রজালিক তরঙ্গ, যে তরঙ্গের ভেতর দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে দেশ। আর লাখো মানুষের মনের গহিনে তিনি গড়ে দিয়েছেন অন্য রকম এক পৃথিবী। আমরা যাঁরা তাঁর এই পৃথিবীর সূচনাকালের প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁরা দেখেছি এক স্বপ্নবান তরুণ শিক্ষককে, সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি, কটি ও চাদর নিয়ে যিনি হাঁটছেন, একের পর এক দুস্তর পারাবার অতিক্রম করছেন।

অবশ্য সায়ীদ ভাইয়ের ক্ষেত্রে হাঁটাটা রীতিমতো ওষুধের কাজ করে। তিনি বলেন, ‘জ্বর হলে আমি হাঁটি, হাঁটলে জ্বর সেরে যায়।’ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এভাবে হাঁটতে হাঁটতেই নতুন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, উৎকর্ষমণ্ডিত, মননশীল, সাহিত্যমনস্ক, স্বপ্নবান মানুষ তৈরি করেছেন যুগ যুগ ধরে। যে গুটিকয় মানুষ পৃথিবীর তাবৎ দর্শন পাঠ করে জীবনের পথকে ভূয়োদর্শনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন, তাঁদের হাতে থাকে জগতের পরিবর্তনের চাবি। সবশেষে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ‘ভূততত্ত্ব’র কথা দিয়ে শেষ করি।

‘ভূতে পাওয়া একজনকে নিয়ে আরেকজনের কথা’ শিরোনামে এই লেখা তিনি লিখেছিলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের উদ্দেশে, “কাঁধে যদি ভূত চাপে তাহলে স্থির থাকা অসম্ভব হয়, সায়ীদ সেটা জানেন, আর ভূতের সংখ্যা যদি একাধিক হয় তাহলে কী ঘটে, তার একটা দৃষ্টান্ত আমার ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। তবে ভূতে পাওয়া জিনিসটা যে সব সময়ই খারাপ, তা মোটেই নয়। কোনো কোনো ভূতের স্বভাবচরিত্রটা বেশ ভালো। ওই ধরনের ভূতপ্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়ুক। তাদের জয় হোক।”